গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ মে ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিজেপি-কংগ্রেস দুজনেই টেম্পোভর্তি কালো টাকা পায়

স্বীকার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তিনি ঘোষণা করুন, আম্বানি-আদানিদের থেকে কত মাল তুলেছেন। কালো টাকার কতগুলো ঝুলি ভরে টাকা মেরেছেন? টেম্পো ভর্তি করে কত টাকার নোট কংগ্রেসের জন্য পৌঁছেছে? কী সওদা হয়েছে যে আপনি রাতারাতি আম্বানি-আদানিদের গালি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন?'

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের মনে বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যেগুলির জবাব তাঁকে দিতে হবে। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করলেন যে, নির্বাচনের সময়ে বড় বড় রাজনৈতিক দলের কাছে ধনকুবেরদের থেকে টেম্পো ভর্তি কালো টাকা যায়, সেই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা নির্বাচনে খাটে এবং তা নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা হলে কি তিনি এটাও স্বীকার করে নিলেন না যে, স্বাধীন মত প্রকাশের নামে বাস্তবে এই নির্বাচন পুঁজিপতিদের কালো টাকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে? তিনি কি দেশের মানুষকে বলবেন, তাঁরা আম্বানি-আদানিদের থেকে কতগুলি টেম্পোভর্তি কালো টাকা অতীতের নির্বাচনগুলিতে এবং এই নির্বাচনে পেয়েছেন?

দ্বিতীয়ত, তিনি যেহেতু জানেন, আম্বানি-আদানিরা টেম্পোভর্তি কালো টাকা পাঠায়, তা হলে সেই কালো টাকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ীদের বাড়িতে

চারের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের চাপে

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল

কর্ণাটক

মাও সে তুঙ তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় চিনের প্রাচীন উপকথার সেই বোকা বুড়োর ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের উদাহরণ দিয়েছিলেন, যে কিনা কোদাল নিয়ে নেমে পড়েছিল বাড়ির সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বিরাট পাহাড় কেটে সরাবে বলে। বুদ্ধিমানেরা বলেছিল, এ ভাবে একা পাহাড় সরানো যায় না। কিন্তু সেই বুড়োকে নিরস্ত করা যায়নি। সে বলেছিল, আমি না পারি আমার ছেলেরা, তাদের ছেলেরা, তাদের ছেলেরা পারবে। একটু একটু করে পাহাড় ঠিক সরবেই। শেষ পর্যন্ত পাহাড় সরিয়েই থেমেছিল সে। লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্বতন বিজেপি রাজ্য সরকারের চালু করা জাতীয় শিক্ষানীতির একটি অঙ্গ চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রত্যাহারে কর্ণাটকের সরকারকে বাধ্য করলেন সে রাজ্যের শিক্ষাপ্রেমী জনগণ। প্রমাণ করলেন, একমাত্র সঠিক লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনের পথেই আজও সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর শাসকের চাপিয়ে দেওয়া জনবিরোধী নীতির পাহাড় সরানো যায়।

দেশ জুড়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবসায়ীকরণ করে দেশের অধিকাংশ মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন

পাঁচের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের সমর্থনে এআইডিএসও-র ডাকে বিক্ষোভ সভা। বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

শেষ দফার এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিলেন

বাঁদিক থেকে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের প্রার্থী রামকুমার মণ্ডল, যাদবপুর কেন্দ্রের কল্পনা নস্কর দত্ত, মথুরাপুর কেন্দ্রের বিশ্বনাথ সরদার, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের জুবের রব্বানি ও জয়নগর কেন্দ্রের নিরঞ্জন নস্কর। নিচে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডানদিকে বরানগর বিধানসভার প্রার্থী সমর সিনহা

নিয়োগ দুর্নীতিতে সংকটে স্কুলশিক্ষা

দায়ী রাজ্য সরকার

সুপ্রিম কোর্টে আপাতত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। একই সাথে কাটেনি শিক্ষার প্রাঙ্গনে শিক্ষকদের ঘিরে যোগ্য-অযোগ্য তরজা। এর বিষময় ফল শুধু স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি জীবনে পড়ছে না, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের উপরেও বর্তাচ্ছে। একই সাথে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরির যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সরকার এবং পুঁজিমালিকরা বেশ কিছু বছর ধরে করে চলেছে তাও অনেকটা জোর পাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায় কার? সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টাকে 'সিস্টেমিক ফ্রড' অর্থাৎ গোটা ব্যবস্থাপনার মধ্যেই দুর্নীতি থাকার কথা বলেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত অবস্থান নিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। তারা কখনও বলছে যোগ্য-অযোগ্য কর্মীদের আলাদা করা সম্ভব, কখনও বলছে যারা চাকরি করছে তাদের মধ্যে অযোগ্য কেউ আছে কি না তা বলা সম্ভব নয়। আবার অযোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যা কত তা নিয়েও আছে ধোঁয়াশা। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার মূল ওএমআর শিট নষ্ট করে ফেললেও তার স্ক্যান করা কপি আছে কি না তাও ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। যদিও শোনা যাচ্ছে কিছুদিন আগেও

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৪২টি ও সারা দেশে ১৫১টি আসনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করুন

স্কুল শিক্ষায় সংকটের জন্য দায়ী রাজ্য সরকার

একের পাতার পর

আরটিআই করা পরীক্ষার্থীদের স্ক্যান করা ওএমআর শিটের কপি দিয়েছে এসএসসি। সবচেয়ে বড় কথা, অন্তত সাড়ে পাঁচ হাজার জন যে পিছনের দরজা দিয়ে অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছে তা এসএসসি মেনে নিয়েছে। যদিও সিবিআই বলছে সংখ্যাটা আট হাজারের বেশি। বিষয়টির আইনি নানা খুঁটিনাটি, সাড়ে পাঁচ হাজার অবৈধ নিয়োগের জন্য সকলের চাকরি যাওয়া ন্যায় বিচার কি না ইত্যাদি প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একটা কথা এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, এই গোটা পরিস্থিতির জন্য মূল দায়ী রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

তারা এই ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি চলতে দিয়েছে। তৃণমূলের মন্ত্রী থেকে শুরু করে এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মতো সংস্থার মাথায় যে সব দলীয় লোককে বসিয়েছে তারাও সারা গায়ে দুর্নীতির কালি মেখেছে। স্কুলে নিয়োগের কোনও একটি ক্ষেত্রও যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ তা তৃণমূলের অতি বড় নেতারাও হলফ করে বলতে পারবেন না। বহু শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও স্কুলে প্রত্যেক বছর নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া কিংবা নিয়োগ করা এ রাজ্যে বন্ধ রয়েছে। ফলে প্যানেলে থাকা, টেট পাশ করা, ওয়েটিং লিস্টে থাকা অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী এক বছরের বেশি সময় ধরে ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও এই চাকরিপ্রার্থীদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেনি। অথচ মন্ত্রীর কন্যা থেকে শুরু করে প্রভাবশালীদের প্রভাবে পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের রক্ষায় রাজ্য সরকার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছে, ঘুষ দিয়ে পাওয়া অযোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভা অতিরিক্ত পদ তৈরি করার সুপারিশ করেছে।

সিবিআই-ইডির অপদার্থতা

একই সাথে সিবিআই, ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপদার্থতাও সমগ্র বিষয়টিকে জটিল করতে সাহায্য করেছে। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত বিগত দুই বছরে কার্যত কিছুই এগোয়নি। তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের সম্মুখীন করার তেমন উদ্যোগ মানুষের চোখে পড়েনি। কেন্দ্রীয় শাসকদলের নির্বাচনী স্বার্থে বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করে ইস্যুটাকে জিইয়ে রাখাটাই একমাত্র লক্ষ্য কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন ২০২২-এর ২৩ জুলাই। এখনও সেই মামলার বিচারই পুরোপুরি শুরু হয়নি। অন্যান্য মামলাগুলির অবস্থাও তাই। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বিচারক হঠাৎ করে বিজেপির ভোটপ্রার্থী হয়ে যাওয়া যেমন বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা প্রশ্ন-সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, তেমনই তা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনকে দুর্বল করেছে।

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে এমনিতেই শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর অভাব। তার জন্য বহু স্কুলই কার্যত চলছে আংশিক সময়ের শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী দিয়ে। এর ওপর যোগ্য অযোগ্য এই নিয়ে স্কুলে টানাপোড়েন ইত্যাদির কারণে স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কই নড়বড়ে হতে বসেছে। ফলে ইতিমধ্যে জনগণের আস্থা হারানো সরকারি স্কুল-শিক্ষাব্যবস্থা আরও আস্থা হারাচ্ছে। এর সুযোগে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত গজিয়ে উঠছে নানা বেসরকারি স্কুল। একেবারে নার্সারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক সব স্তরেই এখন বেসরকারি স্কুলের রমরমা বাড়ছে। সাম্প্রতিক স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দেশের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন, 'সরকারি চাকরি এমনিতেই দুর্লভ'। কথাটা অতি বাস্তব। দেশে মোটামুটি স্থায়ী এবং সম্মানজনক বেতনের কর্মক্ষেত্র আজ এতটাই দুর্লভ যে হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী নিজের সবকিছু সঁপে দিয়েও সরকারি বা এডেড স্কুলে একটা কাজ জোগাড়ে মরিয়া হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে চাকরি বেচে অসাধু উপায়ে পয়সা কামানোর শক্তিশালী চক্র। আজ কোনও সরকারি দপ্তরের নিয়োগই দুর্নীতিমুক্ত নয়। নার্স, পুলিশ, পুরসভার নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতির খবর সামনে আসছে। এই প্রতিটি চক্রের সঙ্গেই সরকারি দলের নেতারা যুক্ত হয়ে আছেন।

নিয়োগ দুর্নীতি বিজেপি শাসিত রাজ্যেও

তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে দলগুলো ভোটের বাজার গরম করছে তাদের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে কোনও মতেই স্বচ্ছ নয়। ভারতে নিয়োগ দুর্নীততে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি হল মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের ব্যাপম কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারিতে বছরের পর বছর ধরে টাকার বিনিময়ে ভর্তির পরীক্ষায় জাল পরীক্ষার্থী বসানো, রেজাল্ট বদলে দিয়ে নিয়োগ ইত্যাদি চলেছে। একেকটা নিয়োগে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। সিবিআই এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট নিযুক্ত সিটের হিসাবেই তাদের তালিকায় থাকা সাক্ষীদের মধ্যে অন্তত ৫০ জন খুন হয়ে গেছেন। এই কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছিল রাজ্যের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থেকে একেবারে রাজ্যপাল পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় প্রায় সাড়ে ছ'শো চিকিৎসকের ডিগ্রিকে অবৈধ ঘোষণা করলেও দোষীদের কোনও শাস্তিই হয়নি।

গত বছর মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার পরিচালিত পাটোয়ারি নিয়োগ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যে, তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিলেন'? প্রশ্ন শুনে সে হতভম্ব হয়ে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এই পরীক্ষার প্রথম দশজনের সাত জনই বিজেপি এমএলএ-র মালিকানাধীন একটি বেসরকারি কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমে যেটুকু আসছে তাতেই বলা হচ্ছে এই কেলেঙ্কারি ব্যাপমকেও ছাপিয়ে যাবে (ইন্ডিয়া টুডে, ১৮ জুলাই, ২৩)। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ফার্মাসি পরীক্ষায় খাতায় শুধু 'জয় শ্রী রাম' লিখে ৫০ শতাংশের ওপর নম্বর পাওয়ার ঘটনা নিয়ে দেশ জুড়ে তোলপাড় হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা উত্তরপ্রদেশে একটা নয় অসংখ্য ঘটছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন (এই সময়, ২৭ এপ্রিল '২৪)। ২০২০ তে উত্তরপ্রদেশে ৬৯ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছিলেন আইপিএস অফিসার সত্যর্থ অনিরুদ্ধ পঙ্কজ। এই তদন্তে কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই এই অফিসারকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার মাঝরাতে নির্দেশ দিয়ে প্রয়াগরাজ পুলিশের বড়কর্তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁকে দীর্ঘদিন কোনও পোস্টিংও দেওয়া হয়নি (এনডি টিভি, ১৬ জুন '২০)।

নিয়োগ দুর্নীতি সিপিএম আমলেও

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আমলে এসএসসি তৈরির আগে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে স্কুলের চাকরি হয়েছে। দলবাজি, স্বজনপোষণের বহু অভিযোগ এসএসসি নিয়োগেও ছিল। চিরকুটে চাকরি পঞ্চায়েত থেকে নানা দপ্তরে ছিল 'স্বাভাবিক' ঘটনা। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ অবিভক্ত মেদিনীপুরে ২২০০ জন প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যোগ্য প্রার্থীদর বঞ্চিত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এদের নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৪-তে ত্রিপুরায় সিপিএম সরকারের নিযুক্ত ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ অবৈধ বলে হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়। সুপ্রিম কোর্টও তা বহাল রাখে।

বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেস-সিপিএম সহ সমস্ত ভোটবাজ দল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যে কানও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে তৈরি। তাদের নীতি-আদর্শহীন রাজনীতি যে কোনও উপায়ে গদি লাভের সাথে যে কোনও উপায়ে টাকা কামানোর পথ করে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজের রক্ষক রাজনীতিই এই দুর্নীতির জন্মদাতা। এটাই এই সীমাহীন দুর্নীতির আসল কারণ। দুর্নীতি রুখতে হলে তাই সঠিক বামপন্থী আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। এ ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে যত চিৎকারই করা হোক তাকে রোখা যাবে না।

জীবনাবসান

দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বর্ষীয়ান নেতা ও ট্রেড ইউনিয়নের পূর্বতন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কমল ভট্টাচার্য দীর্ঘ অসুস্থতার পর গত ২৫ এপ্রিল ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি ও হার্টের সমস্যা, পারকিনসনস ও অন্যান্য বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন।

কমরেড কমল ভট্টাচার্য পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, দলের প্রায় প্রথম যুগে তাঁর ছাত্রজীবনেই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি তরুণ বয়স থেকেই উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়া অঞ্চলে নানা সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রাণবন্ত সমাজকর্মীর ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতি আকৃষ্ট করে। সে সময়ে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। ক্রমে তিনি কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড তাপস দত্ত ও কমরেড সনৎ দত্তের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দলের একজন অগ্রণী সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ষাটের দশকে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার বিচ্যুতির ফলে কমরেড কমল ভট্টাচার্য সে সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশে দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত পার্টি অফিসটি রক্ষা করেন। আপাত কঠোর ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁর ছিল কমরেডদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। অনেকেরই বিপদে-আপদে ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যায় তিনি অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়েছেন। তিনি যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে অনেক কর্মীকেই গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষ করে জগদ্দল-কাঁকিনাড়ার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ইনচেক টায়ার্স, অ্যালায়েন্স জুটমিল, কাঁকিনাড়া জুটমিল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জুটমিল প্রভৃতি কারখানায় তিনি শ্রমিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। এ ভাবেই তিনি নেতৃত্বের সহযোগিতায় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কমরেড কমল ভট্টাচার্য নাগরিক আন্দোলনেরও একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। ভাটপাড়া পৌরসভা এলাকায় পৌরকর বৃদ্ধি, জলকর চালু, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমস্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি একাধিকবার শক্তিশালী নাগরিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ভাটপাড়া পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে পরপর তিনবার এবং ১৯৮০ সালে দুটি ওয়ার্ডে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা তাঁরই পরিচালনায় নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।

প্রয়াত কমরেড কমল ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র তিনি সর্বভারতীয় কাউন্সিল এবং রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য এবং বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম সহ সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৬ সালে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে এআইইউটিইউসি-র যে শ্রমিক প্রতিনিধিদল আমন্ত্রিত হন কমরেড কমল ভট্টাচার্য ছিলেন সেই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য।

কমরেড কমল ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভাটপাড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ভাটপাড়ায় বাসভবন এবং দলের লোকাল অফিসে তাঁর মরদেহ আনা হলে বহু সাধারণ মানুষ উভয় জায়গাতেই সমবেত হন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষের পক্ষে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা, পূর্বতন রাজ্য কমিটির সদস্য বর্ষীয়ান নেতা কমরেড সদানন্দ বাগল, বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা কমরেড অজিত কুণ্ডু সহ জেলা নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকরা। অন্যান্য গণসংগঠন ও লোকাল কমিটিগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। সিপিআই(এম), সিপিআইএমএল, সিপিআইএমএল (লিবারেশন), এপিডিআর, ভাটপাড়া নাগরিক কমিটি প্রভৃতি দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দও মাল্যদান করেন।

কমরেড কমল ভট্টাচার্য লাল সেলাম

উন্নয়নের গল্প ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী মগ্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোয়

আচ্ছা, দশটা বছর কোনও একটা সরকারের পক্ষে কি খুব কম সময়? এই সময়ে জনগণের জন্য কি এমন কিছু করা সম্ভব নয়, যা নির্বাচনের আগে তাঁদের সামনে তুলে ধরা যায়? বলা যায়, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার সরকার এই এই কাজ করেছে, আরও কাজ করার জন্য আমাদের ভোট দাও?

সকলেই বলবেন, অবশ্যই দশটা বছর মানুষের জন্য কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময়। তা হলে বিজেপি নেতাদের নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি থেকে উন্নয়নের গল্প উধাও হয়ে গেল কেন? কেন এখন তাঁদের বক্তৃতায় শুধুই সাম্প্রদায়িকতার বিষ?

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাত্র দশ বছরের মধ্যে লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার দেশের খোল-নলচে পুরো বদলে দিয়েছিল। একটা পিছিয়ে পড়া, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়ে তুলেছিল। মানুষের প্রাথমিক চাহিদাগুলি সব মিটিয়ে ফেলার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল— যা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাশিয়া না-হয় ছিল একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। তার কথা বাদ দেওয়া যাক। নরেন্দ্র মোদির সরকার কি তার দশ বছরের শাসনে চাইলে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারত না? সেগুলিই তো নির্বাচনের আগে দেশের মানুষের সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীরা ভোট চাইতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো কিছু দিন আগেও দু-বেলা দেশের মানুষকে পাঁচ ট্রিলিয়ন, সাত ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির গল্প শোনাচ্ছিলেন, পঞ্চম শক্তিধর দেশ থেকে তৃতীয় শক্তিধর দেশে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্নের কথা বড় গলায় শোনাচ্ছিলেন। তা হলে সে সব ছেড়ে বিদ্বেষ ছড়ানোর রাস্তা ধরছেন কেন?

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি থেকে হঠাৎই উন্নয়নের ফিরিস্তি উধাও। পরিবর্তে দেশের মানুষ দৈনন্দিন জীবন যে হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়গুলিকেই সামনে নিয়ে আসছেন তিনি। সাম্প্রদায়িকতার বিষে ভরপুর তাঁর এখনকার বক্তৃতাগুলি। তীব্র মেরুকরণই যার একমাত্র লক্ষ্য। বিশেষ করে দ্বিতীয় দফা ভোট হয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে যেন অনেকটা মরিয়া দেখাচ্ছে। তার কারণ কি এই যে, তাঁরা বহু খুঁজেও তাঁদের ঝুলিতে মানুষের জন্য সত্যিকারের উন্নয়নের কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না? নির্বাচনের সময়ে ট্রিলিয়ন ডলারের গল্পে যে ভোটের চিঁড়ে ভিজবে না, সাধারণ মানুষ যে বুঝে নিতে চাইবে নিজেদের জীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া কতটুকু পৌঁছেছে, তা বিজেপি নেতারা ভালই বুঝতে পারছেন।

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিতে গিয়ে এখন জনতার উদ্দেশে বলছেন, মোদির ৪০০ আসন দরকার, না হলে কংগ্রেস বাবরি মসজিদের তালা রামমন্দিরে লাগিয়ে দিতে পারে। বলছেন, কংগ্রেস নাকি একটি বিশেষ ধর্মের মানুষের উদ্দেশে বলছে, মোদির বিরুদ্ধে ভোট জিহাদ করো। কখনও তিনি হিন্দুদের উদ্দেশে বলছেন, বিরোধীরা জিতলে আপনাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। বাড়ির মহিলাদের গহনা কেড়ে নেবে। এমনকি হিন্দু মহিলাদের মঙ্গলসূত্রটিও কেড়ে নেবে। পরিষ্কার ধর্মীয় উস্কানি। মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা। লক্ষ্য— হিন্দু ভোটকে একত্রিত করা।

চতুর্থ দফা ভোটের আগে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের তৈরি করা একটি মনগড়া রিপোর্ট তুলে ধরে বিজেপি প্রচার করতে নেমেছে, দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে এবং হিন্দুদের সংখ্যা কমছে। কোথা থেকে পেলেন তাঁরা এমন রিপোর্ট? বাস্তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই জন্মের হার কমছে। মুসলিমদের মধ্যে জন্মের হার সব থেকে বেশি কমেছে।

২০১৯-২১ সালের পঞ্চম জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলছে, জাতীয় গড় টিএফআর (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) নেমে গিয়েছে রিপ্লেসমেন্ট লেভেল ২.১ এর নীচে। ১৯৯২ থেকে ২০১৯ এই তিন দশকের মধ্যে হিন্দুদের টিএফআর ৩.৩ থেকে কমে হয়েছে ১.৯। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ৪.৪ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২.৪-এ। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে সন্তানের জন্মের হার কমেছে তুলনায় অনেক বেশি হারে। (আবাপ, ১৩ মে, ২০২৪)। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মেরুকরণের উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মিথ্যা গল্প ছড়াচ্ছেন বিজেপি নেতারা, যাতে হিন্দুদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে, তারা বিপন্ন এবং একদিন বাড়তে বাড়তে মুসলিমরা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। অবশ্য এমন মিথ্যা ভাষণ প্রধানমন্ত্রীরা এ বারই প্রথম করছেন এমন নয়। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক ছড়ানোর এই অস্ত্রটি তাদের অনেক পুরনো এবং বহু ব্যবহৃত। স্বাধীনতার আগের থেকে তাঁরা এই অস্ত্র ব্যবহার করে আসছেন। বিজেপির পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা পরাধীন দেশে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করত তারও হাতিয়ার ছিল এই একই মিথ্যাচার।

আবার দিশাহীন প্রধানমন্ত্রী তফসিলি জাতি উপজাতি এবং ওবিসিদের সভায় গিয়েও একই রকম মিথ্যাচার করছেন। বলছেন, বিরোধীরা জিতলে তোমাদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিয়ে দেবে। তাই বিজেপিকে ভোট দাও।

আসলে রামমন্দির নিয়ে বিজেপি নেতারা যেমনটি ভেবেছিলেন, এই দিয়েই তাঁরা আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুদের মন জয় করে নেবেন, যে জন্য প্রধানমন্ত্রী অসমাপ্ত মন্দিরই উদ্বোধন করে দিলেন, বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। মন্দির উদ্বোধনের সময় মন্দির ঘিরে যে আবেগ লক্ষ করা গিয়েছিল, গত তিন-চার মাসে তার বেশির ভাগই উধাও। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষার ভয়াবহ ব্যয়বৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে মানুষের তীব্র ক্ষোভ বাকি সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ মানুষের সামনে বিজেপি নেতাদের দিশেহারা দশা। তাই মরিয়া হয়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রাস্তাকেই বেছে নিয়েছেন।

এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দখলে রাখতে এত নীচে নামতে দেখা যায়নি। এত মিথ্যাচার, জাত-ধর্ম-বর্ণে এমন নজিরবিহীন উস্কানি এর আগে কোনও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। দুটো বেশি ভোট পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে যতটুকু মূল্যবোধ টিকে ছিল, সম্প্রীতির মনোভাব অবশিষ্ট ছিল, সেই সবকিছুকে আজ তিনি টেনে নামাচ্ছেন। ধর্ম-বর্ণ-মতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের যে সুর ছিল ভারতের ঐতিহ্য, তাকে ধ্বংস করছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল।

আসলে গত দশ বছরের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা জনমানসে আজ একেবারে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। যুব সমাজ তীব্র বেকারত্বে জর্জরিত। প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে মহিলারা নির্যাতিতা হচ্ছেন। দলিত-আদিবাসী-পিছিয়ে পড়া অংশ এবং সংখ্যালঘুরা প্রবল বৈষম্যের শিকার। দেশ জুড়ে একই ছবি। এই অবস্থায় সর্বত্র বিজেপি নেতারা মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়ছেন। উন্নয়নের গালগল্পে যে মানুষকে ভোলানো যাবে না তা বিজেপি নেতারা বুঝে গেছেন। তাই উন্নয়নের গল্প বাতিল করে প্রধানমন্ত্রী নগ্ন মেরুকরণের রাস্তাকেই বেছে নিয়েছেন।

বাস্তবে অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের সেবক দলগুলি এবং তার নেতারা নৈতিক ভাবে ক্রমাগত বেশি করে দেউলিয়া স্তরে নেমে যাচ্ছেন। পুঁজিবাদের সেবায় যে দল যত বেশি দক্ষতা দেখাচ্ছে সে দলের নেতারা তত বেশি হীন পথ নিচ্ছেন। এ শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত দেউলিয়াপনা, নীতিহীনতা নয়, ব্যবস্থা হিসাবে যে পুঁজিবাদের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন,সেই পুঁজিবাদই আজ নৈতিক ভাবে দেউলিয়া, নিঃস্ব। মানুষকে, সভ্যতাকে তার আর উন্নত কিছু দেওয়ার নেই। ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ পচে গিয়ে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। তারই প্রতিফলন ঘটছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায়। পচে যাওয়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে ব্যক্তি, দল বা সরকারের বদল ঘটিয়ে এই সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

এই সঙ্কট থেকে সমাজকে, সভ্যতাকে, মানুষকে রক্ষা করতে হলে চাই পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নত সমাজব্যবস্থা, উন্নত আদর্শ। তার জন্য চাই মার্ক্সবাদ— আদর্শ হিসাবে যা সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে মানবিক, সবচেয়ে আধুনিক। তাই একজন যথার্থ মার্ক্সবাদী নেতা যখন জনগণের সামনে বক্তব্য রাখেন তখন তা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, পথ দেখায়, তাদের নৈতিক মান উন্নত করে, তাঁদের বাঁচার জন্য লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা জোগায়।

মার্ক্সবাদীদের কাছে নির্বাচনও তার বিপ্লবী সংগ্রামের অংশ। নির্বাচনের মধ্যেও সে মানুষকে সচেতন করে যে, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাকে অটুট রেখে শুধু ভোট দিয়ে হাজার বার সরকার পাল্টেও মানুষের জীবনের দুরবস্থা বদলাবে না। কারণ তার জীবনের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বদলের জন্য দরকার বিপ্লবী সংগ্রামকে তীব্র করা। সেই সংগ্রামের যাঁরা প্রতিনিধি, বিপ্লবী সংগ্রামের বার্তাকে পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্বাচনে বিপ্লবী প্রতিনিধিদের জয়ী করা আজ অত্যন্ত জরুরি, যাতে শোষিত মানুষের বাঁচার দাবিতে রাস্তার লড়াইকে পার্লামেন্টের ভেতরেও পৌঁছে দেওয়া যায়।

নাম মাহাত্ম্য

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি এখন বহুশ্রুত। দেশের শাসক দল বিজেপির যে কোনও সভা, অথবা আরএসএস-এর অনুষ্ঠান হোক, বিজেপি প্রভাবিত রবীন্দ্রজয়ন্তী কিংবা রামনবমীর মিছিল থেকে মসজিদ বা গির্জায় ভাঙচুর— সবই এখন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়েই করা হয়। কিন্তু সেই 'রামনামের' মাহাত্ম্য যে কত তার নিদর্শন পাওয়া গেল উত্তরপ্রদেশের 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্যে। সেখানকার বিজেপি সরকার পরিচালিত 'বীর বাহাদুর সিং পূর্বাঞ্চল ইউনিভার্সিটি'র চার জন ডি-ফার্মা (ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি) ছাত্র তাদের পরীক্ষার খাতায় কেবল 'জয় শ্রীরাম' এবং কয়েকজন ক্রিকেট সেলিব্রিটির নাম লিখেছিল। পরীক্ষার কোনও প্রশ্নের এক লাইন উত্তরও তারা লেখেনি। কিন্তু এই ঘোর 'কলিকালে' রামনামের মাহাত্ম্য বলে তারা পরীক্ষায় শুধু পাশ করেছে তাই নয়, ৫০ শতাংশ নম্বরও পেয়েছে। একজন প্রাক্তন ছাত্র আরটিআই করায় ওই ছাত্রদের উত্তরপত্র রিভিউ করা হয় এবং দেখা যায় তারা প্রত্যেকে আসলে 'শূন্য' (০) পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বন্দনা সিংহ জানিয়েছেন, যে দু'জন শিক্ষক ওই 'অবৈধ' কাজ করেছেন, তদন্তকারী প্যানেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে তাঁদের বরখাস্ত করার সুপারিশ করেছে। যদিও রাজ্যপালের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা দেখায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি ধর্মীয় স্লোগান থেকে ক্রমশ রাজনৈতিক স্লোগান হয়ে এখন নানা অপকর্মের ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য নাম মাহাত্ম্যে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি-ই বা কম কিসে! প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েই ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি ১০ লক্ষ টাকা দামের যে কোটটি পরেছিলেন, তাতে সোনার সুতো দিয়ে গোটা কোট জুড়ে লেখা ছিল তাঁর নাম। সেটি নিলামে কিনতে যাঁরা ঝাঁপিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের নামে আয়কর, সিবিআই বা ইডির অভিযোগ ছিল। ২ কোটি টাকায় যিনি সেই কোট কিনেছিলেন, তাঁর নামেও ছিল কালো টাকা সংক্রান্ত অভিযোগ। আশ্চর্য হল, নামাবলি কোটটি কেনার পর বোধহয় নাম মাহাত্ম্যেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো এঁদের ভুলে যায়।

বিজেপি-কংগ্রেস দুই দলই কালো টাকা পায়

একের পাতার পর

যেমন ইডি-সিবিআই হানা দিচ্ছে, তেমন করে আম্বানি-আদানিদের দফতরে তারা এত দিন হানা দেয়নি কেন? তবে কি তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ধনকুবেরদের বিপুল পরিমাণ কালো টাকার চৌকিদারি করছেন?

তৃতীয়ত, নোট বাতিলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি দেশের মানুষের কাছে ঘোষণা করেছিলেন, এর দ্বারা সমান্তরাল অর্থনীতি হিসাবে কাজ করা কালো টাকাকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা হবে। সেই উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে, তা দেশবাসীর কাছে তিনি কি তবে স্বীকার করে নিলেন? তা যদি না করেন, তবে নোট বাতিলের কারণে দেশবাসীকে যে ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, শতাধিক মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তার দায় তো তাঁর উপরই বর্তায়। অথচ তিনি এই সত্য স্বীকার করেন না। কেন দেশের মানুষ তাঁকে একজন মিথ্যাচারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিপন্ন করবেন না?

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দীর্ঘদিন ধরেই এই সত্যকে তুলে ধরেছে যে, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাটি আসলে পুঁজিবাদী শোষণচক্রকে আড়াল করার একটি অত্যন্ত সুব্যবস্থা। লেনিনের কথা অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন মানে, দেশের মানুষকে কারা শোষণ করবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা স্থির করারই ব্যবস্থা। বুর্জোয়া এই দলগুলির নেতারা তথা সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পুঁজিবাদী শোষণপ্রক্রিয়াটিকে চালু রাখতে একের পর এক আইন পাশ করায়। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট নামক গণতান্ত্রিক ঠাটটিকে সামনে রেখে পর্দার আড়ালে পুঁজিপতি চক্রের মাধ্যমেই বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। এই সব রাজনৈতিক দলগুলির খরচ চালানো, নির্বাচনের বিপুল খরচ চালানো, নেতাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করার, তাঁদের সাহেবিয়ানা, দেদার বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতির খরচ এই ধনকুবেররাই জোগায়। এস ইউ সি আই (সি)-র সেই বক্তব্য কত বড় সত্যি সাম্প্রতিক বন্ড দুর্নীতি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই সত্যটি এতদিন এই সব দলগুলির নেতারা প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন না। বন্ড দুর্নীতি যেমন তা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে, তেমনই রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে এ বার প্রধানমন্ত্রীও সেই কথা স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ এ কথা স্বীকার করতে গেলেন কেন? বিজেপির গত দশ বছরের শাসনে এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মোদি সরকার আসলে ধনকুবেরদেরই সরকার, জনগণের সরকার নয়। জনগণের স্বার্থকে তারা যে আম্বানি-আদানির মতো একচেটে পুঁজিপতিদের পায়ে বলি দিয়েছে আজ সে কথা সাধারণ মানুষেরও মুখে মুখে ঘুরছে।

মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে, জনগণের কঠোর পরিশ্রমে, তাদেরই করের টাকায় একদিন দেশ জুড়ে যে অজস্র রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ, সম্পত্তি ও কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল, উদারিকরণের নামে সেগুলি দেশের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার যে কাজ কংগ্রেস আমলে শুরু হয়েছিল, মোদি শাসনে তা তুঙ্গে উঠেছে। তেল গ্যাস রেল ব্যাঙ্ক বিমা বন্দর খনি জঙ্গল সহ সব কিছু, যার প্রকৃত মালিক দেশের জনগণ, তা আজ নির্বিচারে আদানি-আম্বানিদের হাতে তুলে দিচ্ছে মোদি সরকার। সব কিছুই ঘটছে প্রকাশ্যে, বেপরোয়া ভাবে। এর ফলে দেশ জুড়ে অবাধে লুঠতরাজ চালাচ্ছে এই সব একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা। এই লুটের দ্বারা যতই ধনকুবেরদের ধনের পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে, বিশ্বের ধনীদের তালিকায় তাদের নাম প্রথম সারিতে পৌঁছেছে, ততই মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের আক্রমণ সাধারণ মানুষের উপর তীব্র হয়ে নেমে এসেছে। শ্রমিককে যতক্ষণ খুশি খাটানো, ইচ্ছেমতো কম মাইনে দেওয়া মালিকদের অধিকারে পরিণত হয়েছে। মোদি সরকারের চরিত্র তাই সাধারণ মানুষের কাছে অনেকখানিই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এই রকম অবস্থায় ধনকুবেরদের থেকে খানিকটা দূরত্ব দেখানোর জন্যই প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলেছেন। কারণ, প্রথম দু'দফার নির্বাচনে সাধারণ মানুষের একটা বিরাট সংখ্যা অংশ না নেওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর দলের মধ্যে। তা ছাড়া দেশের মানুষকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বিজেপিই শুধু ধনকুবেরদের থেকে টাকা নেয় না, কংগ্রেসও নেয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই কথা থেকে দেশের জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বুর্জোয়া দলগুলি সবাই ধনকুবেরদের থেকে টাকা নেয়। কালো টাকাও নেয়। আর যারা ধনকুবেরদের থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচন করে, দল চালায়, বিলাসী জীবনযাপন করে, তারা নির্বাচিত হয়ে কাদের স্বার্থে কাজ করে, একই সঙ্গে তা-ও স্পষ্ট হয়ে গেল।

এস ইউ সি আই (সি) এই কথাটিই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে, এই দলগুলি কোনওটিই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী দল নয়— এরা পুঁজিপতি শ্রেণির দল। তাই এনডিএ বা ইন্ডিয়া— যে জোটই হোক, তা আসলে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থরক্ষাকারী পরস্পরের বিকল্প দুটি জোট। মানুষ একটি জোটের অপশাসনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদেরই বিকল্প অন্য একটি জোটকে সামনে নিয়ে আসে। তার পক্ষে টাকা ঢালে, তাদের মালিকানাধীন মিডিয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা তার হয়ে প্রচার চালায়। অসচেতন মানুষ সেই প্রচারে ভুলে ভাবে, এরা বোধহয় তাদের স্বার্থে কাজ করবে। গত আট দশকে সতেরোটা লোকসভা নির্বাচন হয়েছে। সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার পরিবর্তন হয়নি, বরং তা আরও গভীর হয়েছে। সঙ্কট আজ এতই গভীর যে, এই ষড়যন্ত্রকে আর গোপনে রাখা যাচ্ছে না, প্রকাশ্যে এসে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় দেশের শোষিত মানুষকে তাদের নিজেদের শ্রেণিস্বার্থরক্ষাকারী দলকে চিনে নিতে হবে, তার পিছনে দাঁড়াতে হবে, তাকে শক্তিশালী করতে হবে। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী সব দলগুলিকে পরাস্ত করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির রাস্তাকে প্রশস্ত করতে হবে। এটিই সময়ের আহ্বান।

এই সাংসদরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হতে পারেন?

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে দেশে তৃতীয় দফায় মোট প্রার্থীদের মধ্যে ২৯ শতাংশ কোটিপতি। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ' ও 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিসার্চ' (এডিআর)-এর প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে। প্রতি দফাতেই এ রকম প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি। তৃতীয় দফায় দেশের ১২টি রাজ্যের ৯৫টি আসনের ১৩৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৯২ জনই কোটিপতি। চমকে উঠবেন না! গতবারের সাংসদদের সম্পদের পরিমাণের সাথে বড়জোর তুলনা করতে পারেন। গত লোকসভার ৫৪৩ জন সাংসদের ৪৭৫ জনই ছিলেন কোটিপতি। সাংসদদের গড় সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় একুশ কোটি টাকা। (আনন্দবাজার পত্রিকা -১০ মে)

এ রাজ্যে আসানসোল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার ঘোষিত সম্পত্তি ১৩২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, মেদিনীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের ঘোষিত সম্পত্তি ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার বেশি। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার ঘোষিত সম্পত্তি ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল প্রার্থীর গত বারের থেকে সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ৩৩১ শতাংশ, মালদহ উত্তরের বিজেপি প্রার্থীর সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৩৩ শতাংশ। এই দলগুলি এবং তার প্রার্থীরা নির্বাচনে জিততে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে।

২০২৩-এ বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের লজ্জাজনক স্থান ১১১। দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা যখন হু হু করে বাড়ছে, সবচেয়ে কম ওজনের, রুগ্ন-অপুষ্ট শিশুর সংখ্যায় দেশ যখন গোটা বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে, স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত, চাকরির সঙ্কট ভয়াবহ, অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র— সেই সময় নির্বাচনে বিপুল খরচ বড়ই বেমানান। দেশের এই সঙ্কটের চিত্র সামনে থাকলে, জনগণের এই দুর্দশা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলে কোনও জনপ্রতিনিধি এ ভাবে স্রোতের মতো টাকা ঢালতে পারেন না। কিন্তু শাসক দলগুলির অতি ধনী হবু সাংসদরা জেতার লক্ষ্যে টাকার স্রোত বইয়ে দিতে দ্বিধা করছেন না।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যে দেশের ৫০ ভাগ মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের মাত্র ৩ ভাগ রয়েছে সেখানে দেশের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিদের সাড়ে সাতাশি শতাংশ কোটিপতি হয় কী করে? হলে তাঁদের কি এই মানুষদের প্রতিনিধি বলা যায়?

সাংসদদের অনেকেই বলে থাকেন, তাদের একমাত্র পেশা রাজনীতি। তাঁদের ভাষায় সমাজসেবা! তা হলে তাঁরা এত বিপুল সম্পদের অধিকারী হচ্ছেন কী ভাবে? নির্বাচনী বন্ড দুর্নীতি দেখিয়ে দিয়েছে পুঁজিপতিদের দানেই এই দলগুলির সিন্দুক ভরছে। শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের বেআইনি নানা কাজ, অন্যায় এবং দুর্নীতিকে আড়াল করতে তাঁরা শাসক দলগুলি এবং তার নেতা তথা সাংসদদের দ্বারস্থ হন। তারা দু'হাত ভরে দেন সাংসদদের। এদেরই কল্যাণে অবাধে বেআইনি লটারি চলে, বিদ্যুৎ-ওষুধের দাম বাড়ে, সরকারি বরাত হস্তগত হয়, বিনিময়ে দল এবং নেতাদের পকেট ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এ ভাবে দুর্নীতি সংসদীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

এই দুর্নীতির টাকাই দেদার খরচ হয় নির্বাচনে। এই টাকা দিয়েই তারা বেকার যুবকদের কেনে। নির্বাচনে রিগিং করতে, ছাপ্পা ভোট দিতে, প্রতিপক্ষকে শাসানি দিতে এদের কাজে লাগায়। এই টাকা খরচ করেই টিভিতে-খবরের কাগজে-সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়।

সংসদের অভ্যন্তরে সম্পদশালীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সঙ্কুচিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের পরিসর। সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলার লোক, তাদের জন্য নীতি-নির্ধারণের লোক সংসদের ভেতরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধনী সাংসদরা শ্রেণিগত কারণেই গরিব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। বিলাস-বৈভবে দিন কাটানো এই 'জনপ্রতিনিধিদের' পক্ষে গরিবের দুঃখ-ব্যথা অনুভব করা সম্ভব নয়। ছাঁটাই শ্রমিক কিংবা খেতমজুর পরিবারের জীবন কেমন করে কাটে তার খবর রাখা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

স্বভাবতই সম্পদশালী সাংসদদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজি মালিকদের স্বার্থে দেশের নীতি নির্ধারণ হবে, এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দস্তুর হয়ে উঠেছে। এই সাংসদরা পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জনস্বার্থবিরোধী নীতি-আইন পাশ করাচ্ছেন। এই সাংসদরা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইনগুলিকে কোনও আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই নীরবে পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটেখাওয়া ৯৯ শতাংশ জনগণকে ভোটের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ১ শতাংশ মালিক শ্রেণির 'জনপ্রতিনিধি'র ভূমিকা পালন করছেন।

সে কারণে একেকটা দলের অনেক সাংসদ, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশা বাড়তেই থাকে। আসলে কোনও দলের আদর্শ বলে যদি কিছু না থাকে, নীতি বলতে যদি বোঝায় পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা, তা হলে বেশি সংখ্যক সাংসদ থাকলেও ওই দলগুলির ভূমিকা জনস্বার্থের নিরিখে শূন্য হতে বাধ্য। বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ১৭ বার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে, কোনও না কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শাসকের আসনে বসেছে, বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবেও অনেকে জিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের খাদ্য-কাজ-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমেরিকার ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জানাল দক্ষিণ এশীয় ছাত্র সংগঠনগুলি

গাজায় ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে আমেরিকা জুড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলন দমন করতে কর্তৃপক্ষ বহু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর পদক্ষেপ নিচ্ছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়েছে ও তাঁদের গ্রেফতার করেছে। দেশজোড়া এই ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণকে ধিক্কার জানিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ২৯ এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিপুল আশা নিয়ে আমরা তাকিয়ে রয়েছি আমেরিকার ছাত্র আন্দোলনের দিকে। ইজরায়েল রাষ্ট্র এবং যে সব কোম্পানি প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ ও গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নানা সরঞ্জাম জোগান দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ এপ্রিল যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা এখন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ছাত্রছাত্রী, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শত শত প্রগতিশীল ইহুদি ছাত্রছাত্রীরাও, কর্তৃপক্ষের অপরিসীম নিপীড়ন অগ্রাহ্য করে এই আন্দোলনের পিছনে অটল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে আমরা এও লক্ষ করছি, এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমর্থনে শত শত শিক্ষক-অধ্যাপকও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আমরা আমেরিকার এই ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও সংহতি জানাচ্ছি। মাসের পর মাস ধরে আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় যে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে যা এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়েছে, তা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ প্রতিরোধের এই কণ্ঠস্বর শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী যুদ্ধচক্রের বুকে কাঁপন ধরাচ্ছে তাই নয়, গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে আশা ও যুদ্ধবিরোধী সংকল্পের ঢেউ তুলছে।

বিবৃতিতে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে দাবি করা হয়েছে, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপর হামলা করা চলবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ ও মিলিটারি হস্তক্ষেপ চলবে না এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। বস্তুগত ও মেধাগত যা কিছু যুদ্ধ ও গণহত্যায় সাহায্য করে তার বিরুদ্ধে এই বিবৃতিতে গোটা বিশ্বের সমস্ত শান্তিপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে নিচের সংগঠনগুলি—

ভারত ঃ এআইডিএসও, এআইএসএ, এআইএসবি, এআইএসএফ এবং পিএসইউ।
বাংলাদেশ ঃ বিসিএফ, বিএসইউ, ডিএসসি, এইচএসসি, আরএসইউ, আরএসওয়াইএম, এসএফবি এবং এসএসএফ।
নেপাল ঃ এএনএনআইএসইউ(আর) এবং এএনএসইউ(এস)।
পাকিস্তান ঃ ডিএসএফ, এনএসএফ এবং পিএসসি।
শ্রীলঙ্কা ঃ আইইউবিএফ, আইইউএসএফ এবং আরএসইউ।

ইন্দোরে দলের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করলেন ডঃ প্রভাকর

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ পরকলা প্রভাকর ২ মে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর নতুন পুস্তক ‘দ্য ক্রুকেড টিম্বার ইন নিউ ইন্ডিয়া’, কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করায় ৩ মে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করতে পার্টির একটি প্রতিনিধি দল যায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়, বিজ্ঞান ফ্রন্টের পক্ষে কমরেড চন্দন সাঁতরা, সিপিডিআরএস-এর পক্ষে রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ও সভাপতি সৌম্য সেন।

ডঃ প্রভাকরের সাথে এই আলোচনা যথেষ্ট কার্যকরী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান সমাজ পরিবেশে সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর মতামত খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, ডঃ প্রভাকর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী জনবিরোধী অর্থনীতি এবং শ্রমিক-কৃষক সহ নাগরিকদের অধিকার খর্ব করার যে ফ্যাসিবাদী প্রয়াস চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছেন। তাঁর এই সাহসিক প্রচেষ্টা গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি)-র ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। সিপিডিআরএসের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে সিপিডিআরএসের উদ্যোগে কলকাতায় অথবা দিল্লিতে নাগরিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগদান করার ব্যাপারে সম্মতি দেন।

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল

একের পাতার পর

চালিয়ে আসছে বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। এই জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসাবে কর্ণাটকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাবিদ মহলের সাথে কোনও রকম আলাপ-আলোচনা মত বিনিময় ছাড়াই চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে সে রাজ্যের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলে

কর্ণাটকে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির কনভেনশন

এআইডিএসও এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। ২০২১-এর ডিসেম্বরে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে মাইসোরে বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। রাজ্য জুড়ে নানা জায়গায় হাজার হাজার ছাত্র প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেয়। জাতীয় শিক্ষানীতি এবং এই চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের পিছনে যে কায়েমি স্বার্থ কাজ করছে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে মানুষের কাছে তা তুলে ধরা হয়। এই পদক্ষেপ যে কলেজ স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও বিপুল ব্যয়বহুল করে তুলে সাধারণ গরিব ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার উপর মারাত্মক আক্রমণ আনছে, সে কথা বুঝে কর্ণাটকের ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনকে বিপুল সমর্থন জানায়। দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এক কোটি সই সংগ্রহের কর্মসূচি ঘোষণা করে এআইডিএসও। তার মধ্যেই কর্ণাটকের বিজেপি সরকার একাধিক স্কুল মিশিয়ে দেওয়ার নাম করে ১৩ হাজার ৮০০টি সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন আরও একমুখী ও শক্তিশালী হয়। গোটা রাজ্যের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান। ৩৫ হাজারেরও বেশি ছাত্র এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে, রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে ৩৬ লক্ষের বেশি সই সংগ্রহ করে। বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকীতে এক বিরাট সমাবেশ থেকে এই স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আওয়াজ ওঠে— জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করো, জনগণের শিক্ষা কেড়ে নেওয়া চলবে না, শিক্ষা বাঁচাও-মানবতা বাঁচাও।

সর্বাত্মক প্রতিবাদের সামনে সরকারি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সরকার। ২০২৩-এ সরকার পরিবর্তনের পরেও ধারাবাহিক আন্দোলন চলতে থাকে। আন্দোলনের চাপে কর্ণাটকের বর্তমান সরকার ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর সুখদেব থোরাটের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। শিক্ষাজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট মানুষ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের মতের ভিত্তিতে এই কমিশনের পেশ করা অন্তর্বর্তী রিপোর্টে বলা হয়, এই চার বছরের কোর্স সমাজের দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া অংশের সামনে শিক্ষার সুযোগকে সঙ্কুচিত করবে এবং কলেজগুলিতে ইতিমধ্যেই শিক্ষক ও পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব থাকায় তারাও এই চার বছরের কোর্স চালুতে আগ্রহী নয়। এই রিপোর্টের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছরের কোর্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে কর্ণাটক সরকার। সেভ এডুকেশন কমিটির কর্ণাটক রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক আল্লামাপ্রভু বেট্টাদুরু এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। কমিটির পক্ষ থেকে আগামী দিনে ভারতের নবজাগরণের মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নের পরিপূরক বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে কর্ণাটক সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গোটা দেশে এই প্রথম একটি রাজ্যের সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবিত পদক্ষেপ থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হল এবং এই ঐতিহাসিক জয় সম্ভব হল সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সংগ্রামী মানসিকতার কারণেই। শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক-অধ্যাপক-লেখক-চিকিৎসক সহ সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় সচেতন মানুষ এই আন্দোলনকে নিজের আন্দোলন মনে করে এর পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজ, পঙ্কিল ভোটসর্বস্ব রাজনীতি যখন মানুষের মধ্যে আন্দোলনমুখী মানসিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে, ‘আন্দোলন করে কিছু হয় না’ এই মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, তখন কর্ণাটকের এই ঘটনা দেখিয়ে দিল, একমাত্র সঠিক নেতৃত্বে এবং সঠিক নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত গণআন্দোলনই শাসককে মাথা নোওয়াতে বাধ্য করতে পারে। সাধারণ শোষিত মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে বাঁচার এটাই একমাত্র পথ।

ওড়িশায় দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন

পাঠকের মতামত

আসল-নকল চিনতে হবে

তন্দুরির উনুনের মতো সূর্যটা সে দিন জ্বলে উঠেছিল সকাল থেকেই। জরুরি কাজে কলকাতায় যেতেই হবে। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনটা ধরতে হল। ফাঁকাই লাগছে ট্রেনটা, প্রচণ্ড গরম বলেই হয়তো।

আরে ওই তো একটা সিট। বসেই টের পেলাম— যেন উত্তপ্ত চাটু। উরে বাবা! আমার চোখ-মুখ দেখে সহযাত্রীদের একজন বললেন, ক'দিন ধরে এ ভাবেই যাচ্ছি দাদা। কী করব বলুন, পেটের দায়! কথা চলতে চলতে ট্রেনটা থামল নৈহাটিতে। পলকেই জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল চা ভরতি প্লাস্টিকের গ্লাস আর কাগজের চারটে কাপ— পল্টুদা, মাসকাবারি—। কথাটা আর এগোতে পারল না। একটা ছেলে কামরায় চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা আপনাদের কাছে কিছু কথা বলতে এসেছি— সামনে নির্বাচন।

সব যাত্রী অবাক, কী বলবে ছেলেটা?

একবার ভাল করে নজর দিয়ে দেখলাম— ও একা নয়, একটি মেয়ে আর দুজন ছেলে। কিছু কাগজ, বই তাঁদের হাতে।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

বলে চলল ছেলেটা, সব দলকে হারিয়ে আমাদের দলকে ক্ষমতায় আনুন এ কথা বলতে আসিনি আমরা। আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষরা '৫২ সাল থেকে কতবার ভোট দিলাম? জিততে পেরেছি কোনও বার!

আবার সেই বক্তৃতা— ভেবে একটু বিরক্ত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু চোখ গিয়ে পড়ল ছেলেটার উপর— মাঝারি বয়স, পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো। ফিটফাট। যেন অলিন্দ যুদ্ধের বিনয় বোস।

আশ্চর্য, এ আবার কেমন ভোটের বক্তৃতা— চুরির কথা নেই, ডাকাতির কথা নেই, গালিগালাজ নেই, অন্যকে দোষারোপ নেই!

আপনারা একটু ভাবুন। দর দর করে ঘাম বেয়ে পড়ছে কপাল থেকে মুখে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়েই আবার শুরু করল, আচ্ছা, আমাদের কি জেতার কোনও রাস্তা নেই? যতবার ভোট দিচ্ছি জিতছে কারা? মালিকরা, পুঁজিপতিরা। কারণ যে রংয়েই বোতাম টিপি না কেন তারা তো সকলেই প্রভুদের সেবায় নিবেদিত। তাই ৯৯ শতাংশ মানুষ আমরা বারে বারে হারছি।

তা হলে জিতব কী করে? লড়াই করে। লড়াই ছাড়া আমরা কোনও দিন কোনও দাবি আদায় করতে পেরেছি? তাই আমাদের লড়াইয়ে নামতেই হবে। এই কারণেই লড়াইয়ের পার্টিকে শক্তিশালী করা ছাড়া জনগণের জেতার অন্য কোনও পথ নেই। এক নিশ্বাসে বলে গেল ছেলেটা।

আর আমরা? মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছেলেটার দিকে।

হঠাৎ একজন যাত্রী বলে উঠল, খুব তো বড় বড় কথা বলছ ভাই, ভোটের আগে অনেকেই লড়াইয়ের কথা বলে, গদিতে গিয়েই ভুলে যায়।

ছেলেটা ঘাম ভাল করে মুছে ধীর ভাবে বলল— ঠিক বলেছেন, তাই আসল-নকলও চিনে নিতে হবে আমাদেরই। টাকা-পয়সা বুঝে নিতে আসল নকল চিনে নিই না? আলু-পটল কিনতে গেলেও কি ভাল-খারাপ বাছি না? তখন কি বলি, ও-সব বিচার করে কী হবে?

এ সবের মতো সঠিক দলকেও চিনতে হবে, তা না হলে আমরা জিতব কী করে?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি সবাই।

কিছুক্ষণ হল ওরা ট্রেন থেকে নেমে গেছে। কিন্তু ওদের কথাগুলো মাথা থেকে নামছে না কিছুতেই।

আসল-নকল চিনতে হবে। চিনতেই হবে আমাদের।

বিমল বল
হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগণা

তোমরাই পারবে ভারতবাসীকে পথ দেখাতে

আমি শিল্পী গণেশ হালুই এর কাছে গিয়েছিলাম তাঁর চিকিৎসক হিসাবে। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর শৈশবের, কৈশোরের দিনগুলির কথা বলছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে তাঁর ঠিকানা হয়েছিল হাওড়া রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকে উনি কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর কী ভাবে আজ দেশ-বিদেশে একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত হয়েছেন, তা শোনালেন। তিনি একটা কথা বললেন, দেখো আমারও একটা ডিটারমিনেশন ছিল জীবনে, আর ছিল অনেস্টি। তাই হয়তো আমি পেরেছি। আজ তোমরা যারা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল করছ তোমরা হয়তো এখন ছোট, সবাই তোমাদের জানে না, কিন্তু একদিন তোমরাই পারবে ভারতবাসীকে পথ দেখাতে। তোমরা অনেক বড় হও। আর একটা কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আগেও বলেছিলেন। বললেন— কথা এবং কাজে যেন কোনও ফারাক না থাকে দেখো। এটার বড় অভাব আজ।

ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র
ক্রিক রো, কলকাতা ১৪

জয় আপনাদেরই

বিগত প্রায় আট দশকে অসংখ্য ভোট প্রমাণ করেছে ভোটে জেতে অর্থশক্তি, প্রচারশক্তি এবং পেশিশক্তির অধিকারী দল। মানুষ জেতে নীতি-আদর্শ ভিত্তিক লড়াই করে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম মানুষের উপলব্ধির তন্ত্রীতে কীভাবে সুর হয়ে বাজে তার একটা অভিজ্ঞতা রাখছি।

ভোটের প্রচারের সময় একদিন এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, আপনারা তো ৪২টি আসনেই জিতে বসে আছেন। অপ্রস্তুত হয়ে কী এর মর্মার্থ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, অন্য পার্টিগুলির প্রার্থীদের পরিচয় মানুষ জানে। আরও জানে, তারা রাজনীতিতে এসেছে জনগণকে লুঠ করার জন্য। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে, ভোটে জিতে নিজের আখের গোছানোর জন্য। এ জিনিস জনগণ জেনেও অত্যন্ত ঘৃণার সাথেই এদের ভোট দেয় খানিকটা নিরুপায় হয়ে। এই দলগুলির নেতারা সবাই জনগণের ঘৃণারই পাত্র। কিন্তু প্রতিটি কেন্দ্রে আপনাদের প্রতিটি প্রার্থী সৎ নির্ভীক শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত। মানুষের চোখে আপনারা শ্রদ্ধার পাত্র। এটা আপনাদের নৈতিক জয় কি না, বলুন। এই নৈতিক জয়ই একদিন আপনাদের পূর্ণ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, আমিও এই দলেরই একজন। দলের একজন সৈনিক হতে পেরে আমিও মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম।

গৌতম দাস
মালদা

চালু হোক জেলাভিত্তিক ছুটি

বিগত কয়েক বছর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ছুটির তালিকার বাইরেই হুট করে গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়ার একটা রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এপ্রিল-মে মাস থেকে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলা বিশেষত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়িতে গরম কেবল শুরু হয়। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত কিছু দিনের তাপপ্রবাহ ছাড়া বাকি দিনগুলোতে অনেকটা মনোরম আবহাওয়াই থাকে। কিন্তু কলকাতা যে তখন পুড়ছে! মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীরা তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বের হয়েই ঘোষণা করে দেন— কাল থেকে সারা রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল ছুটি। নেতা-মন্ত্রীদের তো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে! কিন্তু কালের নিয়মে সবেতেই আজ ভেজাল। মন্ত্রীদের দৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সীমা টপকে উত্তরের পাহাড়ঘেরা জঙ্গলে প্রবেশই করতে পারে না। তাই তো একবার উত্তরবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাদর জড়িয়েও স্কুলে গিয়ে গ্রীষ্মের ছুটির ঘোষণা করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম পর্বের মূল্যায়ন কোচবিহার জেলার অধিকাংশ স্কুলে এখনও হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের কারণে মূল্যায়ন অনেকটাই পিছিয়ে গেছে। এরই মধ্যে ঘোষিত হয়ে গেল গ্রীষ্মের ছুটি। যে দিন থেকে স্কুলে ছুটি ঘোষণা হল সেই দিন থেকেই মূল্যায়ন শুরু হওয়ার কথা। প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটির কথা শুনে বাড়ি ফিরে গেল। রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব— সবারই আচরণে এটা স্পষ্ট যে সরকারি স্কুলের পরীক্ষা না হলেও কোনও ব্যাপার না। নইলে তারা এই বিষয়টা নিয়ে একটু হলেও ভাবত। উত্তরবঙ্গে ছুটির প্রয়োজন জুন-জুলাই মাসে। সে সময়ে গ্রামবাংলার অনেক স্কুলই বন্যার কারণে বন্ধ রাখতে হয়। আবার উত্তরবঙ্গে ভ্যাপসা গরম শুরু হয় জুন মাসে। সুতরাং অসময়ের ছুটি ভোগ করার পরে প্রবল বর্ষা এবং গরমে স্কুল করতে হয় উত্তরবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসকারী নীতির মধ্যে এই ছুটি-ঐতিহ্য অন্যতম। বেসরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে দিব্যি স্কুল করে চলেছে, সেখানে সরকারি স্কুলে এমনকি মূল্যায়নকেও মান্যতা না দিয়েই ছুটি ঘোষণা করে দিল সরকার। দক্ষিণবঙ্গে এই ছুটির প্রয়োজন হয়ত ছিল, কিন্তু উত্তরবঙ্গে এই ছুটি সত্যিই অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য দক্ষিণবঙ্গেও ছুটি না দিয়ে সকালে স্কুল করলেও হয়তো কাজ হত। তাই ছুটির ক্ষেত্রে অন্তত জেলাভিত্তিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। জেলাভিত্তিক ছুটির প্রচলন যে আগে ছিল, সেটাই বিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষার মতো বিষয়ের কেন্দ্রীকরণ ঠিক নয়। তাই দাবি উঠুক—জেলাভিত্তিক ছুটি চালু হোক আবার।

সুস্মিতা বর্মন
কোচবিহার

সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হতে পারেন?

চারের পাতার পর

মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক করতে এই সাংসদদের দেখা যায়নি। এমনকি এই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে সরব হওয়ার চেষ্টাটুকুও করেনি ওই দলগুলির সাংসদরা।

এর ব্যতিক্রমও আছে। প্রকৃত সংগ্রামী দল যারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিয়ে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে পথ চলে তাদের যদি এক জন সাংসদও থাকেন, তা হলে তিনিই প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর কেন্দ্র থেকে জেতা এস ইউ সি আই (সি)-র সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল এমনই প্রকৃত জনপ্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেছেন। এস ইউ সি আই (সি) শ্রমিক শ্রেণির দল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের আদর্শের ভিত্তিতে ডাঃ মণ্ডল দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কী ভাবে এই বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাতেও জনস্বার্থে বিপ্লবী দলের সাংসদদের ভূমিকা পালন করতে হয়। তিনি সংসদে প্রতিটি জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করেছেন। জনস্বার্থে কী কী কাজ করা দরকার তার প্রস্তাব দিয়েছেন। সাংসদদের বেতনবৃদ্ধির তীব্র বিরোধীতা করেছেন। সাংসদ কোটার টাকা, সাংসদদের বর্ধিত বেতনের টাকা এলাকার সামাজিক কাজে খরচ করে নজির সৃষ্টি করেছেন।

ফলে ধনী সাংসদরা যে পুঁজিপতিদেরই প্রতিনিধিত্ব করবে, সাধারণ মানুষের করবে না, তা বুঝতে হবে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে। নির্বাচিত করতে হবে গরিব, মেহনতি মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম করা প্রতিনিধিদের। সংসদীয় গণতন্ত্র আসলে বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রের খোলসটা দিয়ে পুঁজিপতিদের একনায়কতন্ত্রের কঙ্কালটা ঢাকা থাকে। এখন সেই খোলসটা এতই জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল চেহারাটাকে বুর্জোয়ারা চেষ্টা করেও ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এই শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে যারা বদলানোর ডাক দিচ্ছে, তাদের শক্তিশালী করাই আজ সময়ের আহ্বান।

নারীর ক্ষমতায়ন নির্ভর করে সঠিক আদর্শভিত্তিক রাজনীতির উপর

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে সংবাদপত্রে, সমাজমাধ্যমে নারী সমাজের উন্নতি নিয়ে নানা তথ্য-পরিসংখ্যান উঠে আসছে। বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা কত, কোন দল ক্ষমতায় এলে মহিলাদের উন্নতির জন্য কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা, লেখালিখি চলছে। রাজনীতিতে মহিলারা বেশি করে অংশগ্রহণ করলে, তা প্রগতিরই পরিচয়। কিন্তু এই 'অংশগ্রহণ' বিষয়টাকে কী ভাবে দেখা উচিত? কোন দল কত মহিলা প্রার্থী দিল, কোন দলের ইস্তেহারে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের সমস্যা নিরসনের প্রতিশ্রুতি সংখ্যায় বেশি থাকল বা কোন দলের কতজন মহিলা মন্ত্রী হলেন, শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যান দিয়ে কি নারীসমাজের বাস্তব অগ্রগতির ছবিটা পরিষ্কার হবে? সহজ বুদ্ধিবলে, কোনও রাজনৈতিক দল মহিলাদের সুরক্ষা, সম্মান এবং উন্নয়ন নিয়ে সত্যিই ভাবছে কি না, তা বুঝতে হলে সেই দলের রাজনীতি, দলের নেতা-কর্মীদের রুচি-সংস্কৃতিকে সবার আগে বোঝা দরকার।

বিগত দশ বছর দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা বিজেপি দলটির কথাই ধরা যাক। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সহ আরও কয়েকজন মহিলা মন্ত্রী আছেন বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায়। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু এইসব 'পদাধিকার' বা 'অংশগ্রহণ' কি বিজেপি শাসনে মহিলাদের ন্যূনতম সুরক্ষা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছে? বিজেপি-শাসিত রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ দেশের মধ্যে নারী ধর্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয়। গুজরাত দাঙ্গায় বিলকিস বানোর ধর্ষক ও তাঁর শিশুকন্যার খুনিদের জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে রীতিমতো মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। অন্য ধর্মের মহিলাদের সম্পর্কে যোগী আদিত্যনাথ সহ বিজেপির বিভিন্ন নেতামন্ত্রীরা নানা সময় ভয়াবহ বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন। হাথরসে নির্যাতিতার দেহ পুড়িয়ে, তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে, জম্মুর কাঠুয়ায় আসিফার ধর্ষক-খুনিদের সমর্থনে বিজেপি বিধায়কদের মিছিল করতে দেখা গেছে। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে দিনের পর দিন রাস্তায় ধরনা দেওয়া পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিদের কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পুলিশ তাঁদের টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করেছে। এর কোনও একটি ঘটনাতেও কি বিজেপি সরকারের মহিলা মন্ত্রীরা দুঃখপ্রকাশ করেছেন? কোথাও কি দেখা গেছে, কোনও মন্ত্রী বা সাংসদ মহিলা হয়ে এইসব নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বা তাঁর দলের প্রশ্রয়ে এইসব জঘন্য নারী নির্যাতনের কোনও প্রতিবাদ করেছেন?

বিজেপির মতাদর্শগত অভিভাবক যে আরএসএস সংগঠন, তার প্রধান মোহন ভাগবত যখন 'মহিলাদের কাজ শুধু গৃহকর্ম করা' এমন মন্তব্য করেন এবং একটি চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দেন, তখনও বিজেপির কোনও মহিলা প্রতিনিধি-মন্ত্রী-বিধায়কের প্রতিবাদ শোনা যায়নি। এই ভোটের মরসুমেই বিজেপি সমর্থিত জেডিএস নেতা প্রোজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের ভয়ঙ্কর অভিযোগ সামনে এলে তার দ্রুত তদন্ত করে শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, তিনি বিশেষ পাসপোর্টের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর নাকের ডগা দিয়ে দিব্যি বিদেশে পালিয়ে গেলেন। এগুলি কী প্রমাণ করে? এরা মহিলাদের যথার্থই মানুষের মর্যাদা দেয়? নাকি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মরে করে?

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক প্রধান হয়েছেন একজন মহিলা। কিন্তু এর কতটুকু সুফল সাধারণ মহিলাদের কাছে পৌঁছেছে? নারী পাচার-খুন-ধর্ষণের বাড়বাড়ন্ত এতটুকু কমেনি। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রীর 'সাজানো ঘটনা' বলে অপরাধের গুরুত্ব আড়াল করা, কামদুনির প্রতিবাদীদের 'মাওবাদী' বলে ধমকে চুপ করিয়ে দেওয়া, এমন একের পর এক ঘটনায় মহিলাদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্ষণ-শ্লীলতাহানি-পাচার এর মতো অপরাধ ছাড়াও শিক্ষার হার, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সমতা, অপুষ্ট শিশুর জন্ম, গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য, অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলা শ্রমিকদের দুরবস্থা এমন আরও অজস্র পরিসংখ্যান প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এর বিজ্ঞাপনী জৌলুস বা কন্যাশ্রী-রূপশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি দিয়ে সমাজের লক্ষ লক্ষ মহিলার আর্তনাদ আড়াল করা যাবে না। কাজেই, দেশে বা রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে যতই মহিলারা থাকুন বা ভোটসর্বস্ব দলগুলো নিজেদের 'প্রগতিশীল' প্রমাণ করতে যতই মহিলা প্রার্থীদের দাঁড় করাক, দলের রাজনীতি যদি নীতি-আদর্শহীন হয়, শুধু ক্ষমতার রাজনীতি হয়, তা হলে সে দলের মহিলা প্রতিনিধিরাও মূলত সেই ক্ষমতার সুরেই সুর মেলাবেন বা মেলাতে বাধ্য হবেন। ইস্তেহারে যতই নারী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থাক বা সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণের বিল এনে খাতায় কলমে মহিলাদের অধিকার দেওয়া হোক, সাধারণ নারীদের জীবন যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র সুরাহা তাতে হবে না।

এ রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে বানতলা ধর্ষণকাণ্ডের মতো ভয়ানক ঘটনার পর জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'এমন তো কতই হয়'। সুটিয়ায় সিপিএম নেতা সুশান্ত চৌধুরী ও তার মদতপুষ্ট গুন্ডারা দিনের পর দিন মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করত। প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে মঞ্চ গড়ে তুলে রুখে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে কায়েমি স্বার্থবাদীরা। নেতাই, মরিচঝাঁপি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ বহু ঘটনায় স্থানীয় মহিলাদের উপর, বিরোধী দলের মহিলা কর্মীদের উপর সিপিএমের পুলিশ এবং লেঠেল বাহিনী অত্যাচার করে পার পেয়ে গেছে। অনিল বসু, বিনয় কোঙার মহিলাদের সম্পর্কে নোংরা মন্তব্য করেছেন। ক্ষমতার ৩৪ বছরে কেন্দ্রে, রাজ্যে সিপিএম দলটির মহিলা সাংসদ-বিধায়ক তো কম ছিল না। তাঁরা কি দলের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসে মুখ খুলেছেন বা খুলতে পেরেছেন?

আসলে, নারীদের অবস্থার উন্নতি, নারীর মর্যাদা এবং সুরক্ষা, নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলো সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও জিনিস নয়। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর পুরুষতান্ত্রিক সমাজও এসেছিল সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করেই। নবজাগরণের সময় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদা ও সমানাধিকারের সাথেই সমাজে নারীর মর্যাদা, নারীর অধিকার, কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক জীবনে সমানাধিকারের দাবি উঠেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহিলাদের যতটুকু অধিকার দাবি দাওয়া অর্জিত হয়েছিল, তার পেছনে ছিল দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মতো মানুষরা নারীর অধিকারের জন্য জীবন পণ করে সমাজের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, প্রীতিলতা-মাতঙ্গিনী-রোকেয়া-সাবিত্রীবাই ফুলে-দুর্গাবাঈ-এর মতো নারীরা সেই পিছিয়ে পড়া দেশে মেয়েদের মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন জীবন দিয়ে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে শোষণ আর মুনাফার ওপর, তাই একদিন যে পুঁজিবাদ নারীমুক্তির স্লোগান তুলেছিল, সে যত শক্তিশালী, সংহত হয়েছে তত সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারের সাথে সাথে নারীদের অধিকারও সে পদদলিত করেছে। সামন্ততন্ত্রে সরাসরি সম্পত্তি হিসেবে নারীদের কেনাবেচা চলত, আজ মুমূর্ষু পুঁজিবাদ নিজের মুনাফার প্রয়োজনে নারীকে, নারীদেহকে পণ্য করছে। নাম বা পতাকার রঙ যাই হোক, বাস্তবে বড় বড় দলগুলো ক্ষমতায় বসে এই পুঁজির দাসত্বই করে চলেছে। তাই স্বাধীনতার পর এতগুলো দশক পেরিয়েছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বেও মহিলা বসেছেন, কিন্তু ঘরে ঘরে মেয়েদের কান্না বন্ধ হয়নি। ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, শ্লীলতাহানি, নারী পাচার, কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য ও যৌন হয়রানি সহ ঘরে-বাইরে অজস্র বাধার দেওয়াল আজও পেরোতে হয় মেয়েদের। মালিক-শ্রমিকে বিভক্ত এই সমাজে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ছাড়া, অধিকার অর্জনের বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা ছাড়া নারীমুক্তির লড়াই যে অসম্ভব, এই মূল কথাটি একমাত্র উঠে আসছে বিপ্লবী বামপন্থী দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে গড়ে ওঠা এই দলের বিপ্লবী রাজনীতি মেয়েদের যে মর্যাদাময় জীবনের সন্ধান দিয়ে চলেছে, তার ছোঁওয়াতেই নিজেদের গণআন্দোলনের সৈনিকে পরিণত করার চেষ্টা করেন এ দলের মহিলা কর্মীরা। আদর্শকে ভিত্তি করে নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় এই মহিলারা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজের সামনে এসে দাঁড়ান। এ জন্যই এই দলের মহিলাকর্মীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্টতা অর্জন করেন। লোকসভা নির্বাচনেও সেই নারী মুক্তির বার্তা নিয়েই দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে যাচ্ছেন এসইউসিআই(সি)-র মহিলা প্রার্থীরা। চেনাচ্ছেন মেয়েদের সত্যিকারের মুক্তির রাস্তা।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ইটখোলা অঞ্চলের পার্টিকর্মী কমরেড চুনিলাল মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ৩০ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

১৯৫০-'৬০-এর দশকে ইটখোলা অঞ্চলের গোলাবাড়ি দ্বীপে জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারে ভাগচাষি ও খেতমজুরদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেই সময় গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে ভাগচাষি ও খেতমজুরদের অধিকার রক্ষায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের প্রবল ঢেউ গোলাবাড়ি অঞ্চলকেও প্রভাবিত করে। ১৯৭২-'৭৩ সালে কংগ্রেস-আশ্রিত যে জোতদার-জমিদাররা অত্যাচার চালিয়েছিল, পরে সিপিএম-ফ্রন্টের শাসনকালে তারাই সিপিএম-এর ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়ে নতুন উদ্যমে ভাগচাষি ও খেতমজুরদের উপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করে। আক্রমণ সত্ত্বেও আন্দোলন তীব্র হয় ও গড়ে ওঠে পার্টি সংগঠন। যে গুটিকয়েক কর্মী ওই সময় সাহসিকতার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কমরেড চুনিলাল মণ্ডল অন্যতম। সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের হাতে কমরেড চুনিলাল মণ্ডল আক্রান্ত হন, মিথ্যা কেসে হাজতবাসও করেন। পরবর্তীকালে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ও ক্যান্সারে তিনি আক্রান্ত হন। অসুস্থতার মধ্যেও যতদিন শরীর চলেছে তিনি নিষ্ঠার সাথে পার্টির কাজ করে গিয়েছেন।

কমরেড চুনিলাল মণ্ডলের মৃত্যুর খবর পেয়ে, ইটখোলা অঞ্চলের বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গোলাবাড়ি ৭ নং গ্রামে গিয়ে কমরেড চুনিলাল মণ্ডলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কমরেড চুনীলাল মণ্ডলের মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ হারাল আন্দোলনের এক যোদ্ধাকে, দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড চুনিলাল মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 39 Bengali Weekly May 17, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

জয়নগর কেন্দ্রে দলের প্রচারে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ক্যানিং-পূর্ব বিধানসভার তিনটি বাজার সুন্দিয়া, চন্দনেশ্বর ও বোদরায় ১২ মে এস ইউ সি আই (সি)-র জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্করের উপস্থিতিতে প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি চলছিল।

প্রচারের শেষে প্রার্থী সহ কর্মী-সমর্থকরা শাকসহর বাজারে প্রচারের জন্য যখন যাচ্ছিলেন, তৃণমূল আশ্রিত ৩০-৪০ জন দুষ্কৃতীর বাইক বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। 'কেন এখানে প্রচারে এসেছিস'— বলে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের মারধর শুরু করে। দলের কর্মী রেজাউল ঢালীকে মাটিতে ফেলে মারতে থাকে। তাঁর মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। দুটি হ্যান্ডমাইক সেটও কেড়ে নেয়। এলাকার প্রবীণ নেতা তপন ঘোষ বাধা দিতে গেলে তাঁর উপরেও তারা চড়াও হয়। একটি মোটরবাইকের চাবি ও হেলমেট কেড়ে নেয়। গোটা ঘটনায় পুলিশের কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের কাছে দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়ে দাবি করা হয়—

অবিলম্বে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে হবে, ছিনিয়ে নেওয়া জিনিস ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকায় সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

ভোটে নাগরিক সমাজের ভূমিকা ঃ মত বিনিময় সভা

নির্বাচনকে সামনে রেখে ৪ মে মৌলালি যুবকেন্দ্রের কনফারেন্স হলে 'শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি'র উদ্যোগে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার

বিষয়বস্তু ছিল 'বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের ভূমিকা'।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডাঃ বিনায়ক সেন, কমিটির সভাপতি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত, মেডিকেল কলেজের নাক-কান-গলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ অশোক সাহা, বাসন্তী দেবী গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রী বর্ধন রায়, অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার অচ্যুত ঘোষ, বিশিষ্ট ম্যাক্সিলো-ফেসিয়াল সার্জেন ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি পি চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সর্বজিত সিং, শিক্ষক অভিজিৎ বর্ধন প্রমুখ। এ ছাড়াও চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী সহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ অশোক সামন্ত এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং বর্তমানে সর্বাত্মক সামাজিক সংকটের নিরসনে আন্দোলনই যে একমাত্র পথ সেই অভিমত ব্যক্ত করেন। সভা থেকে বক্তারা আন্দোলনের একমাত্র শক্তি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান।

আইনজীবীদের সাথে আলাপচারিতায় তমলুকের প্রার্থী

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ১০ মে তমলুক জেলা কোর্টের আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আইনজীবীরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে উৎসাহ দেখান। প্রার্থী তাঁদের সামনে বক্তব্য রাখেন। পরে তিনি ল-ক্লার্কদের সঙ্গেও দেখা করেন। আদালত চত্বরে বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রতীক্ষালয়, আধুনিক শৌচাগার এবং আইনজীবী ও ল-ক্লার্কদের জন্য শেড নির্মাণে আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে প্রার্থী জানান। দলের আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে তাঁকে সমর্থন করার আবেদন জানান তিনি। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি সহ জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আপনাদের দলকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না

দলের কয়েক জন নেতা ও কর্মী বাঁকুড়ার একটি বাজারে নির্বাচনী প্রচার করছিলেন। বিভিন্ন জনকে দলের নির্বাচন সংক্রান্ত বই এবং লিফলেট দিচ্ছিলেন। সিপিআইএম দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য যিনি জেলায় বামপন্থী নেতা হিসাবে বিশেষ পরিচিত, কর্মীদের কাছে এসে বললেন, আপনারা ভালই প্রচার চালাচ্ছেন। বিশেষ করে আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের 'অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে বিচার করুন' বইটি বিভিন্ন বামপন্থীদের মধ্যে, এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাড়া ফেলেছে। আপনারা সারা দেশে অনেক আসনে লড়ছেন।

কর্মীদের একজন তাঁকে বলেন, আপনারা কংগ্রেসের সাথে জোট করছেন, কংগ্রেসকে সেকুলার তকমা দিচ্ছেন। এর দ্বারা তো বামপন্থীদের জোট গঠনেই বাধা তৈরি হচ্ছে। অথচ আমরা এ রাজ্যের ৪২ আসনে এবং সারা দেশে ১৫১ আসনে লড়ছি। তিনি বলেন, সেটা জানি, আমরা সারা দেশে মাত্র ৫০ আসনে লড়ছি। কর্মীটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সে কী! কিন্তু আপনাদের তো শক্তি কম নেই।

তিনি বলেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু দলের মধ্যেও বহু কর্মী-সমর্থক উপরতলার নেতাদের তৈরি এই জোট মানতে পারছেন না দেখা যাচ্ছে। এখন তাঁরা আপনাদের দলের বই, পত্রপত্রিকা পড়তে, চর্চা করতেই আগ্রহী দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নিচের তলা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আপনাদের দলকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

* * *

আপনাদেরই খুঁজছিলাম

উত্তর কলকাতার সিমলা এলাকায় প্রচার করছিলেন দলের কর্মীরা। একটি বাড়িতে দরজা খুললেন এক প্রবীণ ভদ্রলোক। দলের নাম শুনেই হাসিমুখে বললেন, তোমাদের প্রার্থী ডাক্তারবাবুর পোস্টার দেখেছি। বলতে বলতেই বাড়িতে ঢুকলেন তাঁর ছেলে। লিফলেটটি হাতে নিয়ে বললেন, আপনারা বাড়িতে এসেছেন খুব ভাল হয়েছে। আপনাদেরই খুঁজছিলাম। যদিও পারিবারিক ভাবে আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদের প্রার্থীকেই ভোট দেব। কারণ এখানে একমাত্র আপনাদের প্রার্থীই আছেন যাঁকে ভোট দেওয়া যায়। দলের তহবিলে সাহায্য করে বললেন, এ বার থেকে আপনাদের কাগজটা দিয়ে যাবেন।

* * *

আপনাদের সঙ্গেই থাকতে চাই

দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জে দলের এক কর্মী এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছু সরকারি আধিকারিকও ছিলেন। দলের কর্মী হিসাবে পরিচয় পেয়ে তাঁদের একজন হাত মিলিয়ে বললেন, সঠিক পার্টিই বেছে নিয়েছেন। আমরা এই পার্টিকে খুবই শ্রদ্ধা করি। দলের নিষ্ঠাবান কর্মীদের দেখলে স্যালুট করি। কথায় কথায় দলের প্রয়াত নেতা সুবোধ ব্যানার্জীর কথা উঠলে তিনি মৃত্যুর সময়েও যে বিপ্লবী দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা শুনে এই আধিকারিকরা গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। একজন বললেন, অবসরের পর মানুষের জন্য কিছু কাজ করতে চাই। তার জন্য আপনাদের সঙ্গেই থাকতে চাই।

আর একজন আধিকারিক বললেন, আমারও অবসর কিছুদিনের মধ্যেই। তারপর আমি আপনাদের বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। কর্মীটি তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন।

* * *

আপনাদেরই তো সামনে আসা উচিত

দমদম কেন্দ্রের কেষ্টপুর বাজারে কর্মীরা দোকানে প্রচার করছিলেন। একটি দোকানে ক্রেতা এক ভদ্রমহিলা নিজের থেকে লিফলেটটি চেয়ে নিয়ে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে চাঁদা দিলেন। বললেন, আপনারা ছাড়া আর কাউকে দেখছি না যাদের উপর ভরসা করা যায়। পাশের দোকানে যেতেই আর এক ক্রেতা ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আপনাদেরই তো সামনে আসা উচিত। প্রচারের ঝড় তুলুন। সমাজ মাধ্যমে আরও প্রচার করুন। কর্মীরা অনুরোধ করলেন, আপনিও পরিচিতদের বলবেন। বললেন, অবশ্যই, আমি তো বলতে শুরু করেছি।

মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন দমদম কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড বনমালী পণ্ডা

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com